

 নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পরের আচরণ (معاملتهم من بعد)

২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অকল্পনীয় বিজয় লাভে সে ভীত হয়ে পড়ে এবং দলবল সহ দ্রুত এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ইসলাম কবুল করে। কিন্তু এটা ছিল বাহ্যিক। তার মনের ব্যাধি আগের মতই ছিল। ফলে তার প্রকাশভঙ্গীতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। যেমন-

(১) জুম'আর দিন খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসরে দভায়মান হওয়ার প্রাক্কালে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে দাঁড়িয়ে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলত,

هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، أَكْرَمَكُمْ اللَّهُ وَأَعَزَّكُمْ بِهِ، فَانصُرُوهُ وَعَزِّرُوهُ، وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

‘হিনি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তোমাদের মাঝে উপস্থিত। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে শক্তিশালী কর। তোমরা তাঁর কথা শোন ও তাঁকে মেনে চল’। বলেই সে বসে পড়ত। তারপর রাসূল (ছাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন’।[1] এগুলি ছিল বদর থেকে ওহাদের মধ্যবর্তী সময়ের আচরণ।

(২) ওয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐদিন ফজরের সময় শাওত (الشَّوْط) নামক স্থান হ'তে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানাকালে সে তার ৩০০ সাথী নিয়ে পিছু হটে যায়। সে ভেবেছিল বাকীরাও তার পথ ধরবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যুদস্ত হবেন। কিন্তু তা হয়নি। বরং কুরায়েশরা কেবল সাময়িক বিজয়ের সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় শূন্য হাতে। তাতে রাসূল (ছাঃ) ও মুসলিম বাহিনীর মনোবলে সামান্যতম চিড় ধরেনি। বরং যুদ্ধের পরের দিনই তারা কুরায়েশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেন। খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান ভয়ে তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত মক্কা অভিমুখে পালিয়ে যান। এসব দেখে-শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আবারো ভীত হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী জুম'আর দিন সে পূর্বের ন্যায় উঠে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসাসহ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আহবান জানায়। কিন্তু এবার মুহল্লীগণ তাকে আর ছাড় দিল না। মসজিদের সকল প্রান্ত হ'তে আওয়ায উঠল **صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ بِأَهْلٍ وَقَدْ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ** 'বস হে আল্লাহর দুশমন! তুমি একাজের যোগ্য নও। তুমি যা করেছ তাতো করেছই'। লোকদের বিক্ষোভের মুখে সে বকবক করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকে, আমি যেন এখানে কোন অপরাধী এসেছি। আমি তাঁরই সমর্থনে বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম'। তখন বাইরে দাঁড়ানো জনৈক আনছার তাকে বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! ফিরে চল। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। জবাবে সে বলল, **وَاللّٰهُ** 'আল্লাহর কসম! আমি চাই না যে তিনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন' (ইবনু হিশাম ২/১০৫)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ - سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (المنافقون ৬-৫)

‘আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, অহংকার বশতঃ বিমুখ হয়ে চলে যেতে। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, তাদের জন্য দু’টিই সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ (মুনাফিকুন ৬৩/৫-৬)।

(৩) ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বনু নাযীর ইহুদী গোত্রকে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ উস্কে দিয়ে বলেছিল, তোমরা মুহাম্মাদ-এর কথামত মদীনা থেকে বের হয়ে যেয়ো না। বরং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আমার দু’হাজার সৈন্য রয়েছে, যারা তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে’।[২] এছাড়াও বনু কুরায়যা ও বনু গাত্তফানের লোকেরা সাহায্য করবে। আল্লাহর ভাষায়,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ -

‘তুমি কি মুনাফিকদের দেখোনি যারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদের বলে, তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারু কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী’ (হাশর ৫৯/১১)।

মুনাফিকদের উপরোক্ত উস্কানিতে বনু নাযীর সহজভাবে বেরিয়ে না গিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর অবরোধের মুখে পড়ে অবশেষে তারা চিরদিনের মত মদীনা থেকে নির্বাসিত হ’ল। অথচ মুনাফিকরা বা অন্য কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

كَمَثَلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - فَكَانَ
عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

‘(মুনাফিকরা) শয়তানের মত। যে মানুষকে কাফের হ’তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্ব পালক আল্লাহকে ভয় করি’। ‘অতঃপর উভয়ের পরিণতি হয় এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আর এটাই হ’ল যালেমদের শাস্তি’ (হাশর ৫৯/১৬-১৭)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ কাফিরদেরকে মুনাফিকদের ‘ভাই’ বলেছেন। এতে পরিষ্কার যে, দু’জনের শাস্তি পরকালে একই।

(৪) ৫ম হিজরীর শাওয়াল ও যুলক্বাদাহ মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা নানাবিধ কথা বলে সাধারণ মুসলমানদের মন ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে। এমনকি খায়রাজ গোত্রের বনু সালামাহর লোকদের মন ভেঙ্গে যায় ও তারা ফিরে যাবার চিন্তা করতে থাকে। তারা এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলে যে, রাসূল আমাদেরকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন, তা সবই প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা আহযাব ১২ হ’তে ২০ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেন।

(৫) ৫ম হিজরীর যুলক্বাদাহ মাসে যখন যয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হয়, তখন উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র হননের চেষ্টা করে।

যায়েদ ছিল নবুঅত-পূর্বকাল থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর পোষ্যপুত্র। তাকে ‘মুহাম্মাদ পুত্র যায়েদ’ (زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) বলে ডাকা হ’ত (ইবনু সা‘দ ৩/৩১)। জাহেলী যুগে পোষ্যপুত্রের স্ত্রী নিজ পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় হারাম গণ্য হ’ত। এই অযৌক্তিক কুপ্রথা ভাঙ্গার জন্যই আল্লাহর হুকুমে এই বিবাহ হয় (আহযাব ৩৩/৩৭)। কিন্তু মুনাফিকরা উল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে কুৎসা রটাতে থাকে। তাদের এই কুৎসা রটনা সাধারণ মুসলমানদের প্রভাবিত করে। যা আজও কিছু মুনাফিক ও দুর্বলচিত্ত কবি-সাহিত্যিক ও রাজনীতিকদের উপজীব্য হয়ে রয়েছে। যয়নবকে বিয়ে করার এই ঘটনার মধ্যে ইহুদী-নাছারাদেরও প্রতিবাদ ছিল। যারা নবী ওয়াযের ও ঈসাকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলত (তওবাহ ৯/৩০)। অথচ সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পুত্র হ’তে পারে না। যেমন অপরের ঔরসজাত সন্তান কখনো নিজ সন্তান হ’তে পারে না। তৃতীয়তঃ ইসলামে চারটির অধিক স্ত্রী একত্রে রাখা নিষিদ্ধ। আর যয়নব ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর পঞ্চম স্ত্রী। অথচ এটি যে ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ‘খাছ’ এবং বিশেষ কারণে বিশেষ অনুমতি (আহযাব ৩৩/৫০), সেকথা তারা পরোয়া করত না। ফলে এটিও ছিল তাদের অপপ্রচারের অন্যতম সুযোগ। এসবই হচ্ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি ছিল বনু মুছতালিক যুদ্ধের পূর্বকাল। এক্ষণে আমরা দেখব প্রথম বারের মত বনু মুছতালিক যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেয়ে এই মুনাফিকরা সেখানে গিয়ে কি ধরনের অপতৎপরতা চালিয়েছিল।-

(৬) ৬ষ্ঠ হিজরীর শা‘বান মাসে বনু মুছতালিক যুদ্ধ হয়। এ সময় মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীরা প্রধানতঃ ২টি বাজে কাজ করে। এক- তার ভাষায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি এবং দুই- হযরত আয়েশার চরিত্রে কালিমা লেপন করে কুৎসা রটনা, যা ইফকের ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রথমটির বিবরণ নিম্নরূপ :

(ক) মুহাজিরদের মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি (تهديد إخراج المهاجرين من المدينة) : বনু মুছতালিক যুদ্ধ শেষে যখন রাসূল (ছাঃ) মুরাইসী‘ ঝর্ণার পাশে অবস্থান করছেন, এমন সময় কিছু লোক পানি নেওয়ার জন্য সেখানে আসে। আগতদের মধ্যে ওমর (রাঃ)-এর একজন কর্মচারী জাহজাহ আল-গেফারী (جَهْجَاهُ الْغَفَارِيُّ) ছিল। তার সঙ্গে সেনান বিন অবারাহ আল-জুহানী (سِنَانُ بْنُ وَبَرَةَ الْجُهَنِيِّ) নামের জনৈক আনছার ব্যক্তির সাথে হঠাৎ ঝগড়া বেধে যায় এবং পরস্পরকে ঘুষি ও লাথি মারে। তখন জুহানী ব্যক্তিটি ‘হে আনছারগণ’ এবং গেফারী ব্যক্তিটি ‘হে মুহাজিরগণ’ বলে চিৎকার দিতে থাকে। চিৎকার শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠলেন, دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ? ‘একি, জাহেলিয়াতের আহবান?’, مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ? ‘বিস্ত’ (বুখারী হা/৪৯০৫)।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দলীয় বা গোত্রীয় পরিচয়ে অন্যায় কাজে প্ররোচনা দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু উক্ত পরিচয়ে সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করা সিদ্ধ। সেকারণ জিহাদের ময়দানে শ্রেণীবিন্যাসের সময় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মুহাজির, আনছার এমনকি আনছারদের মধ্যে আউস ও খায়রাজদের জন্য পৃথক পতাকা ও পৃথক দলনেতা মনোনয়ন দিতেন (দ্রঃ ওহোদের যুদ্ধ অধ্যায়)।

যাইহোক উপরোক্ত ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কর্ণগোচর হ’লে সে এটাকে সুযোগ হিসাবে নিল এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলো, কি আশ্চর্য! তারা এমন কাজ করেছে? আমাদের শহরে বসে তারা আমাদের তাড়িয়ে

দিতে চাচ্ছে? ওরা আমাদের সমকক্ষ হ'তে চাচ্ছে? আমাদের ও তাদের মধ্যে কি তাহ'লে সেই প্রবাদ বাক্যটি কার্যকর হ'তে যাচ্ছে যে, سَمِنَ كَلْبَكَ يَا كَلْبُكَ 'তোমার কুত্তাকে খাইয়ে হুঁষ্টপুষ্ট কর, সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে'। অতঃপর সে বলল, اَلَّذِلُّ مِّنْهَا اَلْأَعْزُ الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ اِلَى الْمَدِينَةِ رَجَعْنَا اَمَّا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ اِلَى الْمَدِينَةِ رَجَعْنَا 'শোন! আল্লাহর কসম! যদি আমরা মদীনায ফিরে যেতে পারি, তাহ'লে অবশ্যই সম্মানিত ব্যক্তির নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সেখান থেকে বের করে দেবে'। অতঃপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, দেখো তোমরাই নিজেরা একাজ করেছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের মাল-সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছ। এক্ষণে তোমাদের হাতে যা কিছু আছে, তা যদি ওদের দেওয়া বন্ধ করে দাও, তাহ'লে অবশ্যই ওরা অন্য কোন এলাকায় চলে যাবে।

যায়েদ বিন আরকাম নামক এক তরুণ গিয়ে সবকথা রাসূল (ছাঃ)-কে জানিয়ে দিল। সেখানে উপস্থিত ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, **مُرْ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ** ‘আববাদ বিন বিশরকে হুকুম দিন, সে গিয়ে ওটাকে শেষ করে দিয়ে আসুক’ (ইবনু হিশাম ২/২৯১)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন, **يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي** ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছাড়ুন! এই মুনাফিকটার গর্দান মেরে আসি’ (বুখারী হা/৪৯০৫)। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, **وَلَكِنْ أَذِنُ** ‘সেটা কেমন করে হয় ওমর! তখন লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছে। না। বরং এখনই রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দাও’। [৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, **أَصْحَابُهُ** ‘ছাড় ওকে। লোকেরা যেন না বলে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছেন’ (বুখারী হা/৪৯০৭)। অথচ তখন রওয়ানা দেওয়ার সময় নয়। এটা তিনি এজন্য করলেন, যাতে মুনাফিকরা কোনরূপ জটলা করার সুযোগ না পায় এবং পরিস্থিতি আরও খারাবের দিকে না যায়। অতঃপর দীর্ঘ একদিন একরাত একটানা চলার পর রাসূল (ছাঃ) এক জায়গায় গিয়ে থামলেন বিশ্রামের জন্য। ক্লান্ত-শ্রান্ত সাথীগণ মাটিতে দেহ রাখতে না রাখতেই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ল। ফলে মুনাফিকরা আর ষড়যন্ত্র পাকানোর সুযোগ পেল না। গৃহবিবাদ এড়ানোর জন্য দ্রুত ও দীর্ঘ ভ্রমণ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর একটি দরদর্শী ও ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত।

অতঃপর ইবনে উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরকাম গিয়ে সব কথা বলে দিয়েছে, তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আল্লাহর কসম করে বলল، وَلَا تَكَلِّمْتُهُ، قَالَ، مَا قُلْتُ مَا قَالَ، ‘আমি ঐসব কথা বলিনি, যা সে আপনাকে বলেছে এবং উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করিনি’ (ইবনু হিশাম ২/২৯১)। তার সাথী লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হ’তে পারে ছোট ছেলেটি ধারণা করে কিছু কথা বলেছে। অথবা সে সব কথা মনে রাখতে পারেনি যা মুরব্বী বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। যায়েদ বলেন، فَأَصَابَنِي هُمُ لَمْ، ‘তাদের এসব কথায় আমি এমন দুঃখ পেয়েছিলাম, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি’ (বুখারী হা/৪৯০০)। অতঃপর আমি মনোকষ্টে বাড়িতেই বসে রইলাম। ইতিমধ্যে সূরা মুনাফিকূন (৭-৮ আয়াত) নাযিল হ’ল। যেখানে বলা হয়:

هُم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ- يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তারা বলে আল্লাহর রাসলের সাথে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করোনা। যাতে তারা সরে পড়ে। অথচ আসমান

ও যমীনের ধন-ভান্ডার আল্লাহরই হাতে। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না’। ‘আর তারা বলে যদি আমরা মদীনায ফিরতে পারি, তাহ’লে সেখান থেকে সম্মানিত লোকেরা অবশ্যই নিকৃষ্টদের বের করে দিবে। অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না’ (মুনাফিকুন ৬৩/৭-৮)। তখন রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে লোক পাঠিয়ে সূরাটি শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, **يَا زَيْدُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ** ‘হে যায়েদ! আল্লাহ তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন’ (বুখারী হা/৪৯০০)।[4]

ওদিকে মদীনার প্রবেশমুখে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ, যিনি অত্যন্ত সৎ এবং মর্যাদাসম্পন্ন মুমিন ও তার পিতার বিপরীতমুখী চরিত্রের যুবক ছিলেন, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে পিতাকে আটকে দিয়ে বললেন, **لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقَرَّ أَنَّكَ الذَّلِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيزُ** ‘আপনি এখান থেকে আর পা বাড়তে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করবেন যে, আপনিই নিকৃষ্ট এবং রাসূল (ছাঃ) সম্মানিত’। অতঃপর সে এ স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়।[5]

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি চান, তবে আমাকে নির্দেশ দিন। আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে তার মাথা এনে দিব’। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, **وَلَكِنْ بِرَأْبَاكَ**, ‘না’। বরং তোমার পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তার সাথে সদাচরণ কর’।[6]

(খ) ইফকের ঘটনা(حديث الإفك) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল কোন যুদ্ধে যাওয়ার আগে স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম উঠতো, তাকে সঙ্গে নিতেন। সে হিসাবে বনু মুছতালিক যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সফরসঙ্গিনী হন। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী বিশ্রামস্থলে তাঁর গলার স্বর্ণহারটি হারিয়ে যায়। যা তিনি তাঁর বোন আসমার নিকট থেকে ধার হিসাবে এনেছিলেন। হাজত সারতে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। ফলে সেখানেই হারটি পড়ে গেছে মনে করে তিনি পুনরায় সেখানে গমন করেন ও হারটি সেখানে পেয়ে যান। ইতিমধ্যে কাফেলা যাত্রা শুরু করে এবং লোকেরা তাঁর হাওদা উঠিয়ে নিয়ে যায়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি ভেবেছিলেন যে, তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। ফলে ঐ ব্যক্তির মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্বেক হয়নি যে, তিনি হাওদার মধ্যে নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) দ্রুত নিজের বিশ্রামস্থলে ফিরে এসে দেখেন যে, সব ফাঁকা। ‘সেখানে নেই কোন আহবানকারী, নেই কোন জবাবদাতা’ (مَا فِيهِ مِنْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٍ) তখন তিনি নিজের স্থানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজে এখুনি লোকেরা এসে যাবে।

ছাফওয়ান বিন মু‘আত্তাল(السَّمِئِيُّ الْمُعَطَّلُ) যিনি কোন কাজে পিছনে পড়েছিলেন, তিনি ব্রহ্মপদে যেতে গিয়ে হঠাৎ মা আয়েশার প্রতি নয়র পড়ায় জোরে ‘ইল্লা লিল্লাহ’ পাঠ করেন ও নিজের উটটি এনে তাঁর পাশে বসিয়ে দেন। আয়েশা (রাঃ) তার শব্দে সজাগ হন ও কোন কথা না বলে উটের পিঠে হাওদায় গিয়ে বসেন। অতঃপর ছাফওয়ান উটের লাগাম ধরে দ্রুত হাঁটতে থাকেন কাফেলা ধরার জন্য। পর্দার হুকুম নাযিলের আগে তিনি আয়েশাকে দেখেছিলেন বলেই তাঁকে সহজে চিনতে পেরেছিলেন। দু’জনের মধ্যে কোন কথাই হয়নি। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর সেনাদল যেখানে বিশ্রাম করছিল, পথপ্রদর্শক ব্যক্তি আমাকে নিয়ে সেখানে তাদের মধ্যে উপস্থিত হ’ল।[7]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, অন্য একটি সফর থেকে ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী ‘বায়দা’ (الْبَيْدَاءُ) নামক বিশ্রামস্থলে পৌঁছেলে আয়েশা (রাঃ)-এর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। ফলে তা খুঁজতে কাফেলা দেরী হওয়ায়

ফজরের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পানি না থাকায় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয় (মায়েদাহ ৬)। ইতিমধ্যে উটের পেটের নীচ থেকে হার খুঁজে পাওয়া যায়। এ ঘটনায় উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, **يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ** ‘হে আবুবকর-পরিবার! এটি উম্মতের জন্য আপনাদের প্রথম অবদান নয়’। [৪]

সৎ ও সরল প্রকৃতির লোকেরা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বাঁকা অন্তরের লোকেরা এবং বিশেষ করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এটাকে কুৎসা রটনার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করল। মদীনায় ফিরে এসে তারা এই সামান্য ঘটনাকে নানা রঙ চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জোটবদ্ধভাবে প্রচার করতে লাগল। তাতে হুজুগে লোকেরা তাদের ঘোঁকার জালে আবদ্ধ হ’ল। এই অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব অহি-র মাধ্যমে পাবার আশায় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ চুপ রইলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পরেও এবিষয়ে কোনরূপ অহী নাযিল না হওয়ায় তিনি একদিন কয়েকজন ছাহাবীকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। তাতে হযরত আলী (রাঃ) ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁকে পরামর্শ দিলেন আয়েশাকে তালুক দেবার জন্য। অপরপক্ষে উসামা ও অন্যান্যগণ তাঁকে রাখার এবং শত্রুদের কথায় কর্ণপাত না করার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অব্যাহত কুৎসা রটনার মনোকষ্ট হ’তে রেহাই পাবার জন্য একদিন মিসরে দাঁড়িয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করলেন। তখন আউস গোত্রের পক্ষে উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) তাকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। একথা শুনে খায়রাজ নেতা সা‘দ বিন ওবাদাহর মধ্যে গোত্রীয় উত্তেজনা জেগে ওঠে এবং তিনি এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল খায়রাজ গোত্রের লোক। এর ফলে মসজিদে উপস্থিত উভয় গোত্রের লোকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে থামিয়ে দেন।

এদিকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাসব্যাপী একটানা পীড়িত থাকেন। বাইরের এতসব অপবাদ ও কুৎসা রটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারেননি। তবে অসুস্থ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে যে আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার কথা ছিল, তা না পেয়ে তিনি মনে মনে কিছুটা অশান্তি বোধ করতে থাকেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর কিছুটা সুস্থতা লাভ করে হাজত সারার উদ্দেশ্যে একরাতে তিনি পিতা আবুবকরের খালা উম্মে মিসতাহর সাথে বাইরে গমন করেন। এ সময় উম্মে মিসতাহ নিজের চাদরে পা জড়িয়ে পড়ে যান এবং নিজের ছেলেকে বদ দো‘আ করেন। আয়েশা (রাঃ) এটাকে অপছন্দ করলে উম্মে মিসতাহ তাকে সব খবর বলে দেন (কেননা তার ছেলে মিসতাহ উক্ত কুৎসা রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিল)। আয়েশা (রাঃ) ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। সেখানে সব কথা জানতে পেরে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দুই রাত ও একদিন নিরুন্ম কাটান ও অবিরতধারে কাঁদতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তার কাছে এসে তাশাহহুদ পাঠের পর বললেন, ‘হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু বাজে কথা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে সত্ত্বর আল্লাহ তোমাকে দোষমুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন পাপকর্মে জড়িয়ে থাক, তাহ’লে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তওবা কর। কেননা বান্দা যখন দোষ স্বীকার করে ও আল্লাহর নিকটে তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করে থাকেন’।

রাসূল (ছাঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে আয়েশার অশ্রু শুকিয়ে গেল। তিনি তার পিতা-মাতাকে এর জবাব দিতে বললেন। কিন্তু তাঁরা এর জবাব খুঁজে পেলেন না। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! যে কথা আপনারা শুনেছেন ও যা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং যাকে আপনারা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন-

এক্ষণে ‘আমি যদি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ’- তবুও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি বিষয়টি স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ- তাহ’লে আপনারা সেটাকে বিশ্বাস করে নিবেন। এমতাবস্থায় আমার ও আপনার মধ্যে ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা হযরত ইউসুফের পিতা (হযরত ইয়াকুব) বলেছিলেন, **فَصَبِرْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ**, ‘অতএব ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম এবং আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কাম্য, যেসব বিষয়ে তোমরা বলছ’ (ইউসুফ ১২/১৮)। একথাগুলো বলেই আয়েশা (রাঃ) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, আমি ভাবছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখাবেন। ‘আমি কখনোই ভাবিনি যে, **وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ**, ‘আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আল্লাহ এমন অহী নাযিল করবেন, যা তেলাওয়াত করা হবে’। এরপর রাসূল (ছাঃ) বা ঘরের কেউ বের হননি, এরি মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অহী নাযিল শুরু হয়ে গেল।

অহি-র অবতরণ শেষ হ’লে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হাসিমুখে আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, **أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ!**, ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে অপবাদ মুক্ত করেছেন’। এতে খুশী হয়ে তার মা তাকে বললেন, আয়েশা ওঠো, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যাও’। কিন্তু আয়েশা অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ**, ‘না আমি তাঁর কাছে যাব না এবং আমি কারু প্রশংসা করব না আল্লাহ ব্যতীত। যিনি আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন’। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তার সতীত্বের তেজ এবং তার প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রগাঢ় ভালোবাসার উপরে গভীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য যে, এই সময় সূরা নূরের ১১ হ’তে ২০ পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয়।

এরপর মিথ্যা অপবাদের দায়ে মিসত্বাহ বিন উছাছাহ (مِسْطَحُ بْنُ أَثَّانَةَ) কবি হাসসান বিন ছাবেত ও হামনা বিনতে জাহশের উপরে ৮০টি করে দোররা মারার শাস্তি কার্যকর করা হয়। কেননা ইসলামী শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি কাউকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়, অতঃপর তা প্রমাণে ব্যর্থ হয়, তাহ’লে শাস্তি স্বরূপ তাকে আশি দোররা বা বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয় (নূর ২৪/৮)। [৯] কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ইফকের ঘটনার মূল নায়ক (رَأْسُ أَهْلِ الْإِفْكِ) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দণ্ড হ’তে মুক্ত রাখা হয়। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, এর কারণ এটা হ’তে পারে যে, আল্লাহ তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি দানের ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন (মুনাফিকুন ৬৩/৫-৬)। অতএব এখন শাস্তি দিলে পরকালের শাস্তি হালকা হয়ে যেতে পারে। অথবা অন্য কোন বিবেচনায় তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি। যেমন ইতিপূর্বে হত্যাযোগ্য অপরাধ করা সত্ত্বেও অনেকবার তাকে হত্যা করা হয়নি’ (যাদুল মা‘আদ ৩/২৩৫-৩৬)। তাছাড়া মুনাফিকরা কখনো তাদের অপরাধ স্বীকার করে না। অতঃপর অন্য যাদের শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা ছিল তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এর ফলে এবং তাদের তওবার কারণে তারা পরকালের শাস্তি হ’তে আল্লাহর রহমতে বেঁচে যাবেন ইনশাআল্লাহ। [১০]

ইফকের ঘটনায় কুরআন নাযিলের ফলে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু হয়। সর্বত্র হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষিত হ’তে থাকে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সর্বত্র অপমানিত ও লাঞ্ছিত হ’তে থাকে। কোন জায়গায় সে কথা বলতে গেলেই লোকেরা ধরে জোর করে তাকে বসিয়ে দিত’। [১১]

মুনাফিকরা বুঝেছিল যে, মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস ছিল তাদের দৃঢ় ঈমান ও পাহাড়সম চারিত্রিক শক্তি। প্রতিটি খাঁটি মুসলিম ছিলেন আল্লাহর দাসত্বে ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যে নিবেদিতপ্রাণ। তাই সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও শত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার দিয়েও তাদেরকে টলানো বা পরাজিত করা যায়নি। সে কারণে তারা

নেতৃত্বের মূল কেন্দ্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের চরিত্র হননের মত নোংরা কাজের দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে সেখানেও তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হ'ল। অথচ ঐসব মুনাফিকদের পুচ্ছধারী বর্তমান যুগের মুসলিম নামধারী বহু কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক ঐসব বাজে কথার ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের কুৎসা রটনা করে চলেছেন। সেই সাথে ইসলামের শত্রুতায় তারা অমুসলিমদের চাইতে এগিয়ে রয়েছেন।

বনু মুছতালিক যুদ্ধের গুরুত্ব(أهمية غزوة المصطلق) :

যুদ্ধের বিচারে বনু মুছতালিক যুদ্ধ তেমন গুরুত্ববহ না হ'লেও মুনাফিকদের অপতৎপরতা সমূহ এবং তার বিপরীতে নবী ও তাঁর পরিবারের পবিত্রতা ঘোষণা এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন ও চরম সামাজিক পরাজয় সূচিত হওয়ার মত বিষয়গুলির কারণে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যার ফলে ইসলামী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং মুসলমান নর-নারীদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির চেতনা অধিকহারে জাগ্রত হয়। সাথে সাথে মুনাফেকীর নাপাকি থেকে সবাই দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ফুটনোট

[1]. ইবনু হিশাম ২/১০৫। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ (তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১১৯৩)।

[2]. ইবনু সা'দ ২/৪৪; আর-রাহীক ২৯৫ পৃঃ।

[3]. ইবনু হিশাম ২/২৯১; সনদ 'মুরসাল' (ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১৪৭২); তবে এ বিষয়ে বুখারী হা/৪৯০৫; মুসলিম হা/২৫৮৪ (৬৩); তিরমিযী হা/৩৩১৫ প্রভৃতিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছসমূহ 'ছহীহ'।

[4]. আল-বিদায়াহ ৪/১৫৭ পৃঃ, ইবনু ইসহাক এটি 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন; ইবনু হিশাম ২/২৯০-৯২; তবে ঘটনাটি সত্য। যা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বুখারী হা/৪৯০০; মুসলিম হা/২৫৮৪; আহমাদ হা/১৪৬৭৩ প্রভৃতি হাদীছে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, রওয়ানা হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে উসায়দ বিন হুযায়ের (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এই অসময়ে কেন রওয়ানা হচ্ছেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার কাছে কি ঐ খবর পৌঁছেনি, যা তোমাদের ঐ ব্যক্তি বলেছেন? এর দ্বারা তিনি ইবনু উবাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন।... তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তার প্রতি নরম হৌন! কেননা তার কওম তার মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। সেকারণ সে মনে করে যে, আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন' (আর-রাহীক ৩৩০ পৃঃ)। বর্ণনাটি 'মুরসাল' বা যঈফ (ঐ, তা'লীক ১৬২ পৃঃ)।

[5]. তিরমিযী হা/৩৩১৫ 'সূরা মুনাফিকুন' অনুচ্ছেদ।

[6]. ইবনু হিশাম ২/২৯৩, ছহীহ ইবনু হিববান হা/৪২৮; ছহীহাহ হা/৩২২৩।

[7]. ইবনু হিশাম ২/২৯৮; সনদ ছহীহ (তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৪৮৬); বুখারী হা/৪১৪১, ৪৭৫০; 'ইফকের কাহিনী অনুচ্ছেদ' (بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ); মুসলিম হা/২৭৭০।

[8]. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩৩৪ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়-৭, হা/৪৬০৭ 'তায়সীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-৩; মুসলিম হা/৮৪২ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-২৮।

[9]. বুখারী ফৎহসহ হা/২৬৬১, ৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০; আহমাদ হা/২৫৬৬৪; ইবনু হিশাম ২/২৯৭-৩০৭; ইবনু কাছীর, তায়সীর সূরা নূর ১১ আয়াত।

[10]. বুখারী হা/৭২১৩; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮।

[11]. আর-রাহীক ৩৩৩ পৃঃ।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এই অবস্থা দেখে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত ওমরকে বললেন, হে ওমর! তোমার ধারণা কি? আল্লাহর কসম! যেদিন তুমি ওকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলে, সেদিন তাকে মারলে অনেকে নাক সিঁটকাতো। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দেই, তবে তারাই তাকে হত্যা করবে। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, وَاللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرَ بَرَكَةٍ مِنْ أَمْرِي, 'আল্লাহর কসম! আমি জেনেছি যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর কাজ অধিক বরকতমন্ডিত আমার কোন কাজের চাইতে' (ইবনু হিশাম ২/২৯৩; আর-রাহীক ৩৩৩ পৃঃ)। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ। যদিও এর ভিত্তি 'ছহীহ' (আর-রাহীক, তা'লীক ১৬৩-৬৪ পৃঃ)।